আমার বয়স তখন এগারো। একমাত্র চেনা পথটা ধরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি। যাচ্ছি আমার মায়ের বাসা থেকে বাবার বাসায়। অনেকে জানতে চায়, বাবা- মা আলাদা হয়ে গেলে বাচ্চাদের কেমন লাগে। এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমার জানা নেই। সত্যি বলতে কী, এটা আমার কাছে অবাক করা কোনো ব্যাপারও নয়। কারণ এই একটা মাত্র জীবনই আমার চেনা। পেছন দিকে যত দূর মনে পড়ে, সব সময়ই ব্যাপারটা এ রকমই ছিল। আমার বোনেরা বলে, একসময় একটা বিশাল সুখী পরিবার ছিল আমাদের। কিন্তু সেসব আমার কাছে গল্পই, প্রায় রূপকথা। আমার মনে পড়ে না, মা-বাবাকে কখনো একসঙ্গে দেখেছি। আমার কাছে এটাই জীবন। আমিও সুখী একটা পরিবারই পেয়েছি, শুধু একটু বিচ্ছিন্ন, এইটুকুই পার্থক্য। আর এই বিচ্ছিন্নতা তো একটা অস্থায়ী অবস্থা, তাই না? একটা বড় ঝগড়া, কিছুদিন তো সময় নেবেই ঠিক হয়ে যাওয়ার জন্য।

সবাই জানতে চায়, মায়ের সঙ্গে থাকা আর সপ্তাহে এক দিন বা তারও চেয়ে কম বাবাকে দেখতে পাওয়ার ব্যাপারটা কেমন? বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে, কার সঙ্গে আমি থাকব, সেটা ঠিক করলাম কী করে? এটা কি সিনেমায় যেমন দেখা যায়, কোর্ট, জজ আর প্রচুর

নাটকীয়তায় ঠাসা, সে রকম কিছু কি না? ব্যাপারটা আসলে খুবই সোজাসাপ্টা। আমি যে আমার মা আর তিন বোনের সঙ্গে থাকব, সেটা একরকম নির্ধারিতই ছিল, কাউকে বলে দিতে হয়নি। বাবা তো ব্যস্ত মানুষ, আমার যত্ন নেবেন কখন? তাঁর সঙ্গে দেখা হয় সপ্তাহে এক দিন বা তার চেয়েও কম। এ- ইবা খারাপ কী! আর কার সঙ্গে আমি আছি বা নেই, তাতে কী আসে- যায়! আজ, কাল কি পরশু, আবার তো সবাই একসঙ্গেই থাকব। আগেকার সেই সব দিনের মতো।

♪

♪

১১ বছর বয়সে আমি প্রথম নিজস্ব মোবাইল ফোন পেলাম। একদিন বাবার বাসায় গেছি। উনি কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মোবাইল ফোন আছে কি না। বললাম, নেই। কোনো ভাবান্তর দেখলাম না। শুধু পরদিন একটা ঝকঝকে নতুন ফোন নিয়ে হাজির হলেন আমার কাছে (মানে আমার মায়ের বাসায়)। খুব খুশি হয়েছিলাম। ছোট্ট, ধূসর রঙের একটা সেট। আটটা আলাদা রিংটোন বাজে। টর্চও জ্বলে। তার চেয়ে বড় ব্যাপার, আমাদের স্কুলে আমিই প্রথম, যে নিজস্ব ফোনের মালিক। পরদিন স্কুলে গিয়ে আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে বললাম ফোনের কথা। সে- ও উত্তেজিত। দুজনে মিলে আমাদের গ্রেডের সব সেকশনের ব্ল্যাকবোর্ডে ফোন নম্বর লিখে রাখলাম। দুর্দান্ত একটা দিন কাটল।

♪
♪

আমি দুপুরে ঘুমাতে খুব অপছন্দ করি, এটা কি আগে বলেছি? বিকেলে ঘুমানো আমার খুবই অপছন্দের। পরদিন স্কুল থেকে ফিরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার বোনের ঘরে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম, অল্প কিছুক্ষণ ঘুমাব। বোন কলেজ থেকে এসে উঠিয়ে দেবে। সে ওঠায়নি। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমালাম। ঘুম ভাঙল রাত আটটার দিকে। ভাবলাম, হোমওয়ার্ক ফেলে সারা দিন ঘুমানোর জন্য বকা খেতে হবে। স্কুলের ড্রেসটাও চেঞ্জ করিনি। আমি সারা বাড়ি হেঁটে বেড়াচ্ছি। সবাই বাসায়। রাত আটটা, স্কুল ইউনিফর্ম পরা আমি, সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছি—মাথায় কিছু ঢুকছে না! কেউ আমাকে খেয়ালও করছে না! আমি যেন অদৃশ্য!

♪
♪

আমার বোনই প্রথম জানাল, মা-বাবার ডিভোর্স হয়ে গেছে। এর মানে কী, বুঝতে পারলাম না। সবাই দেখি হতভম্ব, বিপর্যস্ত। অনুমান করলাম, এমন কিছু ঘটেছে, যা সেপারেশনের চেয়েও খারাপ। একটা পরিবার শুধু আলাদা থাকছে, ব্যাপারটা এখন আর মোটেও সে রকম নেই। কিন্তু তাতে এখন যে ঠিক কী দাঁড়াল, মাথায় ঢুকছে না। বুকটা ভার হয়ে গেল। মা আর সব কটি বোন এমনভাবে ভেঙে পড়ল, দেখে অবাক লাগছে। আমারও কেন ওদের মতো খারাপ

লাগছে না? কেন আমিও ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছি না? মনে হলো, হয়তো ওদের মতোন একটা সুখী পরিবারের স্মৃতি আমার নেই, তাই!

♪

♪

প্রথম কয়েকটা মাস সবকিছু গুমোট হয়ে থাকল। কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু কেউ সেটা নিয়ে কথা বলছে না। এই না-বলা দুঃখের কোন দিকটা নৈতিক আর কোনটা অনৈতিক, বুঝতে পারছি না। বাবা কি দোষী? তাঁর সঙ্গে কি কথা বলা বন্ধ করে দেব? নাকি এটা তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে? আমি কি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারব? তাতে কি মায়ের প্রতি অবিচার করা হবে? মা কি কষ্ট পাবেন? এসব প্রশ্ন বুকে ভার হয়ে চেপে বসল। কী করব! যা-ই করি না কেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলোর কাউকে না কাউকে প্রচণ্ড কষ্ট দেওয়া হবে। ডিভোর্সের শোকের চেয়েও আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল এসব চিন্তা।

♪

♪

তারপর এমন সময় এল, দিনের পর দিন বাবার সঙ্গে দেখা হয় না, কিন্তু ফোনে কথা হচ্ছে সারাক্ষণই। বাবা পেশায় লেখক, অসম্ভব জনপ্রিয়, তবে নিজেকে তিনি বলেন গল্পকার। তাঁর উপন্যাস প্রতিবছর বেস্ট সেলার হয়। তাঁর সিনেমাগুলোও একই রকম জনপ্রিয়। তাঁর টিভি নাটক প্রতি ঈদের প্রধান আকর্ষণ। গল্প লেখার জন্য

লেখকদের মাঝেমধ্যে প্রয়োজন পড়ে উদ্ভট সব তথ্যের। তিনি এ রকম অদ্ভুত সব প্রশ্ন নিয়ে আমাকে হুটহাট ফোন করতেন: দশটি বিরলতম ফোবিয়া কী কী? পশুপাখিরাও কি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে? গোল্ডফিশের স্মৃতি কতক্ষণ থাকে? বাবা আর ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনের মাঝখানে প্রধান সংযোগবিন্দুটি আমি। এসব জরুরি তথ্যসেবার বাইরেও সারা দিনে কী ঘটল, স্কুলে আজ কী করলাম না-করলাম ইত্যাদি টুকটাক কিছু নিয়ে কথা বলতাম আমরা। খুব অবাক লাগে, ব্যাখ্যা পাই না, কীভাবে সময়ের সাথে সাথে দুজন কাছাকাছি যেতে থাকলাম!

♪

♪

♪

আমার বয়স তখন তেরো। বাবার লাইব্রেরি ঘরে বসে আ ব্রিফ হিস্টোরি অব টাইম পড়ছি। আর উনি লিখছেন। এক দিনে লেখার কোটা শেষ হয়েছে মনে হলে আমরা ডিভিডি কিনতে বেরিয়ে পড়লাম রাইফেলস স্কয়ারের উদ্দেশে। উনি বেছে নেন ওয়ান ফ্লিউ ওভার দ্য কাক্কুস নেস্ট আর নো ম্যানস ল্যান্ড, যেসব ছবি উনি চান যে আমি দেখি। আমি বেছে নিই স্পাইডারম্যান আর স্পেস জ্যাম। কাউন্টারে ছবির স্তূপ জমে গেলে আমি আবার চোখ বোলাতে থাকি কী কী কিনছি। বেছে বেছে বের করি, কোন কোনটা আগে দেখা হয়ে গেছে, দোকানদারেরা বিব্রত হয় (বাবার ভুলো মন, আমি না থাকলে দোকানদারেরা এক মাসে একই ছবি তিন-চার কপি

ধরিয়ে দেবে)। আমরা সব ধরনের ছবি দেখি। বাজি ধরে বলতে পারি, ওই বয়সে, অন্য যে কারোর চেয়ে, বাবার সঙ্গে বসে আমি বেশি ছবি দেখেছি। যখন বাবার সঙ্গে থাকি না, ছুটির দিনটা কাটাচ্ছি মায়ের সঙ্গে, মাঝরাতে টেক্সট পাই—‘বাবা, আই মিস ইউ। আই অ্যাম লোনলি।’

♥

♥

বাবা শুধু এতটুকুই বলেন। মা- ও জানতে চান না বাবার সঙ্গে এতটা সময় কেমন কাটল, কী কী ঘটল। অন্তত আমার কাছ থেকে না। একবার শুনেছি চাচির সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন, ‘তুমি তো জানো, ও কেমন কথার ওস্তাদ, কথা দিয়ে কীভাবে মানুষকে বশ করে। কীভাবে লোকজনকে মুগ্ধ করতে হয়, ওর জানা আছে। নুহাশ বাবার বশে চলে গেছে। ও বাবার সান্নিধ্য পছন্দ করে, আপত্তি নেই, বরং আলাদা হয়ে গেলেই আমার খারাপ লাগত। কিন্তু নুহাশ তো জানে না ওর বাবা আসলে কেমন! ওর বাবা ওকে বেড়াতে নিয়ে যায়, একসঙ্গে সিনেমা দেখে। আর পরীক্ষায় খারাপ করলে আমি বকা দিই। তাতে বাবার প্রতি দরদ আরও বাড়ে ওর। কিন্তু সে যে কখনো ওর দায়িত্ব নেবে না, সেটা নুহাশ বোঝে না। আমার খুব ভয় হয়, একদিন ছেলেটা খুব কষ্ট পাবে।’

♪

♪

♪

তাঁর কণ্ঠে রাজ্যের উৎকণ্ঠা। কিন্তু আমি বুঝি না এই উদ্বেগ, এই উৎকণ্ঠা কীসের! তত দিনে দুঃখটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি আমি। মনে মনে একটা তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে ফেলেছি, যেটা এখনো মেনে চলি। ভালোবাসা নির্দিষ্ট, প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদা। একজনের থেকে ভালোবাসা কেড়ে নিয়ে অন্যজনের জন্য ভালোবাসা প্রমাণ করা যায় না। চাইলেও সেটা করা সম্ভব নয়। ভালোবাসা ফেরত নেওয়া যায় না, তাই না?

♪

♪

♪

মায়ের বাসা দূরে নয়। বাবা আর তাঁর জগতে আমি আচ্ছন্ন হয়ে থাকি। কৈশোরের প্রথম বছরগুলো কেটেছে বাবার মতো হয়ে ওঠার তীব্র বাসনায়। উনি যা করেন, যা বলেন, যেভাবে বলেন, আমি গভীর অভিনিবেশে লক্ষ করি। যখন উনি কথা বলেন, জগৎ থমকে থাকে। ঘরভর্তি লোকজন সবাই চুপ করে শোনে তার কথা। উচ্চস্বর নন, রাজনীতিবিদদের মতো গলা কাঁপান না, অভিনেতার মতো সৌকর্য দেখান না। তিনি কেবল গল্প বলেন। তাঁর মুখে সবকিছুই গল্প হয়ে যায়। সকালে বেরিয়েছেন মর্নিং ওয়াকে, তা-ও গল্প। দুপুরে কী খেয়েছেন, সেটাও গল্প। সামান্য ঘটনাকেও অসামান্য করে তোলেন তিনি। কী করে করেন, আমার মাথায় ঢোকে না। আয়নার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকি, তাঁর মতো করে কথা বলার চেষ্টা করি, হাত

নাড়ি তাঁর মতো করে, তাঁর মতোই কথার মধ্যে বিরতি দিই। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠা সব বিরতি। একটা গল্পের মাঝখানে এসে তিনি হয়তো থেমে যান, ভ্রু কুঁচকান, দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেবেন। আপনি হয়তো ভেবে বসবেন, উনি প্রসঙ্গ ভুলে গেছেন, ততক্ষণে আরেক গল্পে ঢুকে পড়েছেন তিনি, একই রকম মনোমুগ্ধকর আরেকটা গল্প। এই নীরবতা আপনার হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দেবে। তিনি আরেকবার কথা না বলে ওঠা পর্যন্ত আর সচল হবে না হৃদপিণ্ড। আমি তাঁর বই পড়া শুরু করি কেবল এটা দেখতে যে বাচনভঙ্গির মতোই তাঁর লেখাও এমন জাদুকরি কি না। তাঁর লেখা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। বন্ধুবান্ধব যখন হ্যারি পটার পড়ছে, আমি পড়ছি হিমু। হিমু তাঁর উপন্যাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্রগুলোর একটি। বুদ্ধিদীপ্ত এই সদানন্দ যুবকটি হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। হিমু চরিত্রের প্রতি আমার এই মুগ্ধতা আমার বোনদেরও ভালো লেগেছিল। একজন তো একটা হলুদ পাঞ্জাবিই বানিয়ে দিল। আমাকে সেই পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় দেখে বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন, তাঁর চোখে দ্যুতি খেলা করে গেল। তাঁর কাছে এটা কোনো সামান্য ব্যাপার নয়। তাঁর সৃষ্টিকর্মকে আমি ধারণ করছি। তাঁরই বীজ, আরেকটি বাহনে। তাঁর শিশুর মতো উৎফুল্ল হয়ে ওঠা দেখে আমি অবাক হই! আমি যেবার তাঁকে গিয়ে বললাম, ও-লেভেলে সব বিষয়ে ‘এ’ পেয়েছি, সেদিন এর ধারেকাছে খুশিও দেখিনি। সেদিন শুধু

বলেছিলেন, ‘তুমি তো পাবেই। তুমি আমার ছেলে না! এর চেয়ে কম তো আশা করি না বাবা!’

♪

♪

♪

সময় গড়ালে অনেক কিছুই বদলে গেল, তবে একটা রেওয়াজ আমরা বহাল রেখেছিলাম। প্রতি ঈদে ভোর থাকতে চলে যাই বাবার বাসায়, তাঁকে ঘুম থেকে তুলি। তারপর দুজনে রওনা দিই ঈদগাহে নামাজ পড়তে। বয়স যখন আরও কম ছিল, বাবা ভয় পেতেন, লোকের ভিড়ে হারিয়ে যাব কি না। তাই ঘাড়ে তুলে নিতেন আমাকে। গোটা ময়দানের চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেতাম পিঠে বসে: সাদা টুপি পরে শত শত লোক আসছে ঈদগাহে নামাজ পড়তে। দূরে ছোপ ছোপ রং—গেটের কাছে বেলুনঅলা ঘুরছে। যখন আঠারো বছর বয়স, নামাজ শেষ হলে বাবা নাশতার দাওয়াত দিতেন। দাওয়াত যে দিতে হতো, এ থেকেই অনেকটা বোঝা যায়—অনেক কিছুই আর আগের মতো নেই। চিপস, চকলেট আর বেবি পাউডারের গন্ধে এখন ভরপুর বাবার বাসাটা। ঝকমকে ম্যাকবুক আর হাইস্পিড ইন্টারনেটে বাসা সজ্জিত। যে অ্যাপার্টমেন্ট একসময় ছিল আমার নিরাপদ স্বর্গ, আমার দ্বিতীয় নিবাস, এখন সেখানে র‍্যাকভর্তি নতুন ধরনের ডিভিডি। টম অ্যান্ড জেরি, ফোর ইন ওয়ান কার্টুন কালেকশন, এইট ইন ওয়ান হিন্দি মুভি কালেকশন। এক বিউটিফুল মাইন্ড-এরই

তিনখানা কপি। রাত তিনটায় আর এসএমএস এসে উপস্থিত হয় না, যাতে বলা থাকে, তিনি আমাকে মিস করছেন। আমি মনে মনে তাঁকে বললাম, বেস্ট অব লাক। সুখী হওয়ার জন্য আমাকে আর দরকার নেই তাঁর (গুডলাক বাবা, আশা করি একই ছবি বারবার দেখে সুখে আছ!)। ভালো হতো যদি উনি নিজে আমাকে বলতেন। তা না, আমাকে ট্যাবলয়েড থেকে জানতে হলো তাঁর বিয়ের কথা। আমরা কখনো এ নিয়ে কথা বলিনি। সময় গড়িয়েছে, আর এটা আমাদের দুজনের ভেতরটাকে কুরে কুরে খেয়েছে। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ছুটি কীভাবে কাটাব, কোনো পরিকল্পনা আছে কি না। আমি সরলভাবে বললাম, পরিকল্পনা আছে আমার পরিবারের সঙ্গে কাটানোর। বলার পরই তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি অদ্ভুত মন খারাপ করাভাবে তাকিয়ে আছেন। তিনি যে কতটা কষ্ট পেয়েছেন, বুঝতে বেশ কিছুক্ষণ লেগেছিল। অন্য আরেক দিন আমি ফোন করে বললাম, আমি তাঁর বাড়ির রাস্তায়। বললেন, তিনি বাসায় নেই। তাঁর পরিবার নিয়ে বাইরে বেরিয়েছেন। তিনি দেখতে পেলেন না, আমি কতটা কষ্ট পেলাম ।

♪

♪

♪

আমার বয়স তখন উনিশ। ভার্সিটিতে পড়ি। আমার সঙ্গে যারা পড়ে, তারা সবাই আমার চেয়ে কমপক্ষে এক

সেমিস্টার ছোট। কারণ, কয়েক মাস আগে বাবার কোলোরেকটাল ক্যানসার ধরা পড়েছে। যখন শুনলাম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি সেমিস্টার ড্রপ দিলাম। বাবা কথাচ্ছলে একদা বলেছিলেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে তাঁর ভালো লাগবে। পরের কয়েকটা মাস ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়া শুরু করলাম। মা আর বোনেরা বলল, সিদ্ধান্তটা ঠিক হলো না। কেননা, এত কম সময়ে পরীক্ষায় পাস করা গেলেও ভর্তি হওয়া কঠিন হবে। আমি এত কিছু ভাবছি না তখন, ভর্তি হতে বদ্ধপরিকর। বাসা থেকে বেরোই না, দিনে আট থেকে নয় ঘণ্টা পড়ি। ব্যস্ত সময় কাটে। জীবনের একটা লক্ষ্য খুঁজে পাচ্ছি। আমি তো তাঁকে সারিয়ে তুলতে পারব না, অন্তত তাঁকে গর্বিত করে তুলতে তো পারব! রেজাল্ট বেরোল। আমি তাঁকে দেখতে গেলাম।

♪

♪

♪

বললাম, চান্স পাইনি। উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। আমরা এ নিয়ে হাসাহাসি করলাম। আমি ব্র্যাকে পরের সেমিস্টার ধরলাম, চিকিতসার জন্য বাবা দেশ ছাড়লেন। গণমাধ্যমওয়ালারা এই জনপ্রিয় লেখকের স্বাস্থ্যের নিয়মিত সর্বশেষ খবর প্রচার করে যাচ্ছে। কোনো দিন বলে, উনি ভালোর দিকে। কোনো দিন লেখে, অবস্থার অবনতি। আর সব সংবাদ শেষ হয় এই একই বাক্য দিয়ে: ‘নিউইয়র্কে তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে বসবাস

করছেন...।’ আমি ওই বাক্যটি পড়ার আগেই থেমে যাই। আমি সেপারেশন সইতে পারি, ডিভোর্স মানতে পারি, এমনকি ক্যানসারের খবর সহ্য করতে পারি, কিন্তু নিজেকে অদৃশ্য মনে হওয়া মেনে নিতে পারি না কখনো। শোকে কাতর হতে পারি, কিন্তু নিজেকে কোনো দিন ‘তাঁর ছেলে না’ বলে বোধ করার অনুভূতি সহ্য করতে পারি না।

♪
♪
♪

নিউইয়র্কে দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক কেমোথেরাপির পর তিনি ঢাকায় ফিরে এসেছেন। ফোন করে আমাকে তাঁর ওখানে ডাকলেন। বললেন, আমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। তাঁর বাসায় লোক গিজগিজ করছে। সারা রাত তাদের সঙ্গে কাটালেন তিনি। তাঁর বাসার চারপাশে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ালাম, ভিড়ভাট্টা আমার ভালো লাগে না। অতিথিরা চলে যেতে শুরু করলে তিনি আমাকে এক কোনায় ডেকে নিলেন। আমি একটু একটু কাঁপছি, মনে হলো তিনি সেটা লক্ষ করেননি। বললেন, আমার বোনেদের মিস করেন তিনি, তাদের আরও কাছে পেলে তাঁর ভালো লাগত। মনে মনে বললাম, আর কিছু কি বলার নেই বাবা! আমি অপেক্ষা করছি। তিনি আবার কথা বলতে শুরু করলেন, এখন খুব ধীরে কথা বলেন। বললেন, তাঁর পরিবার নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। তিনি চলে গেলে তাদের কী হবে। বললেন, ছোট দুই ছেলের ভবিষ্যৎ কী হবে?

দুশ্চিন্তায় রাতে তাঁর ঘুম হয় না। তিনি থামেন। আমি অপেক্ষা করি। অনেকক্ষণ থেমে থাকেন তিনি। আমার হৃৎস্পন্দন থেমে থাকে। আমি অপেক্ষা করে যেতে থাকি। তারপর বুঝতে পারি, ব্যাপারটা কী। তাঁর কথা আছে, তবে আমাকে বলার জন্য নয়। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকি, ধীর গতিতে। তখনো আশা, তাঁর হয়তো অন্য আর কিছু একটা বলার আছে। তিনি আর কিছু বলেন না। তাঁর থেমে যাওয়াটা কোনো বিরতি ছিল না। তাঁর সঙ্গে সেই শেষ দেখা।

♪

♪

♪

শীত এসে পড়ছে। এখনো আমার বয়স উনিশ। সেদিন তাঁর জন্মদিন। তিনি তখনো নিউইয়র্কে। আমি ভিডিও কলে তাঁকে অভিনন্দন জানালাম। বিনা চুলে তাঁকে চিনতে কষ্ট হলো আমার। শীত দ্রুত চলে গেল। এসে পড়ল আমার বিশতম জন্মদিন। আমি কোনো আয়োজন করলাম না। বাবার এক বন্ধু দরজায় হাজির হলেন। হাতে কেক। কেকে হ্যাপি বার্থডে লেখা নেই। একটা প্লেইন চকোলেট কেক। তাতে লেখা: “বাবা, আই মিস ইউ।” আমার দিনটা আনন্দের হয়ে গেল। আমার এই ছোট্ট অদ্ভুত পরিবার নিয়ে আমি সব সময়ই সুখী। সেই বছরের মধ্য জুলাইতে একদিন আমার বোন আমাকে ঘুম থেকে তুলল। বলল, বাবা মারা যাচ্ছেন। তিনি নিউইয়র্কের একটা হাসপাতালের আইসিইউতে

অচেতন শুয়ে আছেন। আর এক ঘণ্টা আছে। এক ঘণ্টা পর তাঁর শারীরিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হবে। বাড়িজুড়ে অসহ্য নীরবতা। প্রায় এ রকমই একটা মুহূর্ত কি আমি আগে কাটিয়েছি! দুপুরের ঘুম আমি ঘৃণা করি।

♪
♪
♪

লেখকেরা কষ্টের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, ‘চোখের সামনেটা ঝাপসা হয়ে গেল,’ বা ‘কীভাবে সময় কেটে গেল জানি না,’ বা মাঝে মাঝে লেখেন, ‘আমি কিছু অনুভব করলাম না।’ ওই একটি ঘণ্টা পেরোতে ঠিক একটি ঘণ্টাই ব্যয় হলো। ফোনটা পেল আমার বোন। সে বলল, বাবা আর নেই। আমার স্মৃতিতে কিছুই ঝাপসা হয়ে গেল না। এর পরের প্রতিটি মুহূর্ত আমি মনে করতে পারি। সবকিছুই আমি অনুভব করেছি। প্রতিটি মেসেজ, প্রতিটি ফোন কল মনে আছে আমার।

♪
♪
♪

যেন আবার জন্ম হলো আমার। মৃত হয়ে জন্মালাম। শূন্য হয়ে জন্মালাম। পরের কয়েকটা দিন চলল প্রতিটি বন্ধু, প্রত্যেক পরিচিতজন এবং প্রত্যেক অপরিচিতের সঙ্গে দেখা করা। যতজন মেয়ে আমাকে ভালোবেসেছে, যারা

কোনোদিন আমার কথা ভেবেছে বা ভাবেনি, সবাই এসে আমাকে খুঁজে নিয়েছে, সমবেদনা নিয়ে তাকিয়েছে আমার চোখের দিকে। সব স্নেহ নিংড়ে আমার চোখে তাকিয়েছে তারা, কিন্তু বিনিময়ে সেখানে দেখতে পেয়েছে কেবল শূন্যতা। এটা কোনো ক্ষত না, একটা সেপারেশন না, যেটা সারিয়ে তোলা যায়। এটা বরং ছড়িয়ে পড়ে, শরীরে দানা বাঁধে, হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত এক ক্যানসার।

♪

♪

♪

তখন খুব ভোর। আজ ওরা নিউইয়র্ক থেকে বাবাকে নিয়ে আসবে জানাজা আর দাফনের জন্য। সবাই নিঃশব্দে প্রস্তুত হচ্ছে। আমি ঘুম ভেঙে দেখলাম, আয়রন করা সাদা পাঞ্জাবি সুন্দর পরিপাটি ভাঁজ করা আমার বিছানার পাশে। আমার বোন বলল, আর আধা ঘণ্টার মধ্যে আমরা রওনা দেব। আমি কিছু বললাম না। তারা এখনই বেরোবে। আমার প্রস্তুত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখে তারা হতবাক। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলতে পারল না।

‘তুমি কী সত্যি এটা পরে যেতে চাও?’

আমি কিছু বললাম না।

‘সবাই এটা নিয়ে কথা বলবে, বুঝতে পারছ! তোমার ভালো লাগবে না। সবাই ভাববে, সবাই মনে করবে তুমি...’

আমার আরেক বোন তাকে থামিয়ে দিল। এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

‘মোটু, তোর যা খুশি তুই পর। তোর যা ভালো লাগে। যা করলে বাবার ভালো লাগবে বলে তোর মনে হয়, তাই কর।’ বোনেরা আমাকে মোটু বলে, পটকা বলে। ছোটবেলায় গোলগাল ছিলাম, সেই ডাকনাম আজও থেকে গেছে।

বাবার মৃত্যু জাতীয় ঘটনা। পুরো দেশ শোক করছে। ক্যামেরা জ্বলে উঠছে। কোথাও নৈঃশব্দ্য নেই, এক মুহূর্তের নির্জনতা নেই। বাবাকে আমার শেষ বিদায় জানানোর মুহূর্তটি লাইভ সম্প্রচার হচ্ছে, সারা দেশবাসীর দেখার জন্য। আমার কিছুই যায়- আসে না। আমি এখানেই থাকতে চেয়েছি। তাঁর জানাজার সময় হয়ে এল। তাঁকে দাফন করার আগে শেষ মোনাজাত। সবার চোখ আমাদের ওপর নিবদ্ধ। ঈদগাহ মাঠে জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে তাঁর মরদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি। এই প্রথম যে তিনি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেন, তা নয়। কিন্তু এবারই প্রথম, আমি আমার কাঁধে বহন করতে পারছি তাঁর ভার। এবার আমি জানি, আমি কে। আমি তাঁর সবচেয়ে বড় ভক্ত। তাঁর সবচেয়ে কট্টর সমালোচক। আর তাঁর সবচেয়ে বড় ছেলে। আমি জানি, আমি কে।

♪

♪

♪

এখন আমার ২১ বছর বয়স। একটা খুবই সুবিধাজনক জীবন আমি কাটিয়েছি। এ নিয়ে কক্ষনো কোনো অভিযোগ ছিল না আমার। একটা অসাধারণ মা পেয়েছি আমি, যিনি আমাকে বুঝতে পারেন, আমি যা-ই করি না কেন, সমর্থন জোগান। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোন পেয়েছি আমি, তাদের সবার এখন নিজেদের সন্তান আছে। মামা হওয়া খুবই চমৎকার এক অভিজ্ঞতা—মজা আছে, কিন্তু দায়দায়িত্ব নেই।

আর আমি এমন এক বাবার গর্বিত সন্তান, যিনি সেরা গল্পগুলো বলতে পেরেছেন। অবাক লাগে, এত কিছুর পরও আমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলাম। ধীরে ধীরে কীভাবে আমরা দূরে সরে গেছি, ভাবতে কষ্ট হয়। যখন একা হই, কোনো কাজ থাকে না, আমার মন ছুটে যায় এক অন্ধকার কোণে, যেখানে একটা ক্ষীণ স্বর ফিসফিস করে বলে, আমি ছিলাম তাঁর নিতান্তই এক সখের বস্তু, অন্য কোথাও সুখ খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত যার দিকে তিনি স্বল্পকালীন মনোযোগ ব্যয় করেছিলেন মাত্র। তাঁর বাহবা পাওয়ার পেছনে আজীবন ছুটেছি আমি, আমার সব আগ্রহ আর অভ্যাস গড়ে উঠেছে এই এক প্রবণতা থেকেই। তা আর ত্যাগ করতে পারিনি। তাঁর জন্যই তৈরি হয়েছি আমি, কিন্তু পর্যাপ্ত হতে পারিনি। ওই ফিসফিস করা কণ্ঠস্বরে আমি কান দিই না, আমার বাবা আর তাঁর গল্প ওই কণ্ঠস্বরের চেয়ে জোরাল। আমার কাছে তিনি নেই, কিন্তু তাঁর গল্পগুলো থেকে গেছে। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন। আমি নিশ্চিত, ভালোবাসতেন। হয়তো

তাঁর মনোযোগ অন্যত্র সরে গেছে, হয়তো সুখ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, আর একা বোধ করেননি। কিন্তু এটা তো ঠিক যে কেউ কারও বিকল্প হতে পারে না। ভালোবাসা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।